মানবাধিকার বার্তা

thro.org.in

জুলাই, ২০২৬ তৃতীয় সংখ্যা

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন

-:সম্পাদকীয়:-

জরুরি অবস্থার স্বৈরতন্ত্র বনাম অঘোষিত জরুরি অবস্থার ফ্যাসিবাদী শাসন

২৫শে জুন ১৯৭৫। গভীর ঘুমে নিমজ্জিত জাতির পায়ে শেকল পড়ানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোন বৈঠক ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কিচেন কেবিনেটের পরামর্শে সংবিধানের ৩৫৬ ধারার অপপ্রয়োগ করে আভ্যন্তরীণ অবস্থা জারি করা হয়। ১২ই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহন লাল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে বিজিত প্রার্থী রাজ নারায়ণের দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে শ্রীমতি গান্ধীর নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় শংকিত হয়ে পরেন করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় দেশজুড়ে গন অসন্তোষের জোয়ার বয়ছিল। দুর্নীতির প্রশ্নে সরকার ও শাসকদল ক্রমশ কোনঠাসা হচ্ছিল। ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট, গুজরাটে নবনির্মাণ আন্দোলন, বিহারে জেপির নেতৃত্বে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকদের লড়াই সংগ্রামে শাসক শ্রেণীর পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছিল। এর সাথে যুক্ত হলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গদী হারানোর আশঙ্কা। কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে চন্দ্রশেখর মোহনধারিয়া, কৃষ্ণকানত প্রমুখদের উদ্যোগ নেতা পরিবর্তনের দাবি দানা বাঁধছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। ২১শে জুন বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ারের অবকাশ কালীন বেঞ্চ এলাহাবাদ কোটের রায় এর উপর শর্তাধীন স্থগিতাদেশ জারি করে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আইনজীবীরা চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তা মঞ্জুর করেনি। শর্তাধীন স্থগিতাদেশের ফলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন না। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করলেন। আভ্যন্তরীন জরুরি

অবস্থা জারীর মত পরিস্থিতি ছিল না। সাংবিধানিক শাসন দেশে বিপন্ন হয়নি। বিপন্ন হয়ে পড়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন। নিজের বিপদকে দেশের বিপদ বলে বলে চালানো হল। শুরু হলো ব্যাপক দমন পীড়ন। বিরোধীদের নির্বিচারে গ্রেফতার, সংবাদ পত্রের কন্ঠরোধ, সেন্সরসিপ, ২৫ দফা ও ২০ দফার অনুশাসন, নির্বিচারে গ্রেফতার, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের টুটি টিপে ধরা, সারাদেশ জুড়ে ইন্দিরা বন্দনা। ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা, চামচাদের স্তাবকতার নয়া কীর্তি স্থাপন। গণতন্ত্র নেই, ফলে শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলন করার অধিকারের উপর আক্রমণও লাগাম ছাড়া। বোনাস বন্ধ, মহার্ঘ বন্ধ, কারখানা কারখানায় নির্বিচারে ছাঁটাই, জমি থেকে কৃষকদের ব্যাপক হারে উচ্ছেদ। থানার লকআপ গুলোতে রাজবন্দি ও সাধারণ বন্দিদের উপর নির্যাতন কোন রকম বাঁধা বন্ধন হীন। জরুরি অবস্থায় গরীবদের সর্বনাশ। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। পুজিপতিদের পৌষ মাস। ২৫ শে জুন জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে দেশের তাবড় তাবড় শিল্পপতিরা দিল্লির রাজপথে মিছিল করলেন। গন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। মিছিল করে গিয়ে তারা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানালেন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য। জরুরী অবস্থায তাদের পোয়া বারো। বড় সুখের সময়। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের ঝামেলা থেকে দেশ আপাতত মুক্ত। জরুরী অবস্থার সময় সুপ্রিম কোর্ট দেশের জাতির পাশে দাঁড়াতে পারেনি। এডিএম জব্বলপুর বনাম শিবকান্ত শুক্লা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধান বেঞ্চ চার একের সংখ্যা গরিষ্ঠ রায়ে, বলেন জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের বাঁচার সাংবিধানিক অধিকার মুলতবি থাকে। খোলসা করে বললে দাঁড়ায়, জরুরী অবস্থার সময় সরকার ইচ্ছে করলে নাগরিকদের মেরেও ফেলতে পারে। বিচারপতি খান্না প্রতিবাদী একক রায়ে বলেন জরুরী অবস্থার সময়ও নাগরিকদের বাঁচার অধিকার অলঙঘনীয়। বিনা বিচারে আটকের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ জরুরী অবস্থায় আটক ব্যক্তির কাছ থেকে

কেড়ে নিতে পারে না। বলিষ্ঠ প্রতিবাদী রায় দেওয়ার জন্য বিচারপতি খাননাকে খেসারত দিতে হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁকে বঞ্চিত করে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে সিনিয়র বিচারপতি হিসেবে তাঁরই প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল। প্রতিবাদে বিচারপতি খান্না পদত্যাগ করেন। জাতির দুর্দিনে সুপ্রিম কোর্ট জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ৭৭ এর ফেব্রুয়ারিতে শ্রীমতী গান্ধী সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছিল । নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতাসীন হলে জরুর অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ কমে যাবে। কিন্তু শ্রীমতি গান্ধী হিসেবে ভুল করেন। ছত্রখান বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হলো দেশব্যাপী পরিবর্তন হওয়ায়। নির্বাচনে মুখের মত জবাব দিল ভারতবাসী। অবশ্যই তখন ভোটারদের সরকারকে নির্বাচিত করার সুযোগ ছিল। এখন উলট পুরান।

অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা আর দ্বিতীয়বারের জন্য জারি হয়নি। ৭৫এর জরুরি অবস্থা থেকে শাসকরা শিক্ষা নিয়েছে। নাগরিকদের জন্য জুন ১৯৭৫ ফেব্রুয়ারি ৭৭ এই ১৮ মাস অনেক শিক্ষা রেখে দিয়ে গেছে। বর্তমানে চলছে অঘোষিত জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থার ঘোষণা না করেও কিভাবে জরুরি অবস্থার চাইতে ১০০ গুন ব্যাপকতায় গণতন্ত্র, সংবিধান ও আইনের শাসনের অন্তর্জলী যাত্রা নিশ্চিত করা যায় তার সাক্ষী বিগত এক দশকের বেশি সময় কাল। ২০১৪ তে নির্বাচনের মাধ্যমে আর এস এস পরিচালিত বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়। তারপর পর পর দুবার লোকসভা ভোটে জয়ী হয়ে এখন অব্দি টানা ক্ষমতায় বিজেপি। ছল বলে কৌশলে প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বিজেপির দখলে। দেশকে বিরোধী মুক্ত করতে মরিয়া আরএসএস ও বিজেপি। ভারত ভাবনার বিপরীতে আর এস এসের অবস্থান। আরএসএসের ঘোষিত লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপন করা। ভারতবর্ষ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ভূখণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকের। এতে আর এস এস বিশ্বাস করে না। স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএসের কোন ভূমিকা ছিল না। জাতি , ধর্ম , বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে

প্রত্যেক ভারতবাসীর সমান অধিকার ও মর্যাদায় আর এস এস বিশ্বাস করে না। সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদায় আরএসএসের আস্থা নেই। ইতালির মুসোলিনি ও জার্মানির হিটলারের বনদনা আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতারা করেছিলেন। ২০১৪ থেকে ক্রমে কমে ভারত বর্ষে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হচ্ছে। সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার এখন প্রশ্নের মুখে। প্রতিটি দেশবাসীকে প্রতিদিন নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেই দমন পীড়ন। স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। সংসদে গৃহীত একের পর এক আইনের লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রকারান্তরে সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা। তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণ, যুক্তি, তর্ক, প্রশ্ন নিষিদ্ধ । বিচার বহির্ভূত হত্যা, বিচার বহির্ভূত শাস্তি । গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত ঠুটো জগন্নাথ। এক দেশ এক নেতা এই মহা-আখ্যান এর কম্বলের নীচে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধিতাকে ধামাচাপা দেওয়া। বেকারী ভয়াবহ, মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, অর্থনৈতিক বৈষম্য বিকট, কোন ডায়লগ বা সংলাপ নয়, শুধুই মনোলগ। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত দেশবাসীকে শুনতেই হবে। কিন্তু দেশবাসীর মন কি বাত শোনার দরকারও নেই। ঘোষিত জরুরী অবস্থার স্বৈরতন্ত্র বনাম অঘোষিত জরুরি অবস্থার ফ্যাসিবাদী শাসন। এ থেকে মুক্তির পথ আমাদের খুঁজতেই হবে।

সূচিপত্র

১. টাকার শক্তি হ্রাস. - গৌতম রায় বর্মন / ৭
২. ১৯৪৭ মার্চেই দলনির্বিশেষে হিন্দু মধ্যবিত্তের রায়- বাংলা ভাগ,
ইতিহাস শিক্ষার বিড়ম্বনা -পার্থ চট্টোপাধ্যায় /৯
৩. সিজিমালী পাহাড়ের গর্জন বেদান্ত তুমি দূর হটো - মিহিরলাল রায়/১৭
৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিবেশগত কিছু প্রশ্ন -দীপ্রদীধিতি রায়বর্মণ /২২
৫. বিচার বহির্ভূত হত্যা ও বিচার বহির্ভূত শাস্তির "নব্য স্বাভাবিকতায়"
- হাজত হিংসায় বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু - পুরুষোত্তম রায় বর্মন/৩০
৬.একটি জরুরি স্বীকৃতি - অলকানন্দা চৌধুরী /৪১
৭. ত্রিপুরার ৩৬ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীর অন্ধকারময় জীবন
অবসানের দাবী জয়ী হবেই - রতন দেবনাথ/৪৪
৮. টি এইচ আর ওর তৃতীয় খোয়াই জেলা সম্মেলন /৪৭
৯. মানবাধিকার : প্রতিবাদে ও উদযাপনে টি এইচ আর ও - মনিময় রায় /৪৯

টাকার শক্তি হ্রাস

- গৌতম রায় বর্মন

বাজারে জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয় হয়। ক্রেতা ক্রয় করেন। বিক্রেতা বিক্রি করেন । এই দুইজনের মধ্যে বিনিময় হয়। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় । ভারতে ব্যবহৃত অর্থকে রুপি বা টাকা বলা হয়। ক্রেতা টাকা দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে জিনিস নেয়। এভাবে টাকা এক হাত থেকে অন্য হাতে যায়। জিনিসপত্রের দামের উপর নির্ভর করে কত টাকা দিয়ে কি পরিমান জিনিস ক্রয় করা যাবে। ধরা যাক্ চাওলের দর ৩৫ টাকা কেজি। অর্থাৎ চাওল কিনতে ৩৫ টাকা দিতে হবে। এখন যদি চাওলের নিরিখে টাকার দাম নির্ধারণ করি তাহলে হিসেবটা হবে, ৩৫ টাকা সমান ১ কেজি, চাওল। বছর দুই আগেও চাওলের দাম আরো কম ছিল। ২০ টাকা কেজি ছিল। অর্থাৎ ১ কেজি চাওলের জন্য পকেটের ২০ টাকা খরচ করতে হত । সে সময় ২০ টাকা সমান ১ কেজি চাওল ছিল। এর থেকে বোঝা যায় দিন দিন টাকার দাম কমছে। দামের এই পতনের জন্য একই পরিমান জিনিস কিনতে আগের চাইতে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। একে টাকার মূল্যহ্রাস বলে। অর্থনীতির ভাষায় বলা হয়, টাকার আন্তদেশীয় মূল্যহ্রাস। ভারতের যে কোন জায়গায় ভারতীয় রুপী দিয়ে কেনাকাটা করা যায়। কিন্তু যদি লন্ডন থেকে কোন ভারতীয় জিনিস ক্রয় করতে চান তাহলে তাকে পাউন্ডে দাম মিটাতে হবে। পাউন্ড হল ব্রিটেনের মুদ্রা। প্রথমে, তাকে টাকা দিয়ে পাউন্ড সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে ১ টাকা সমান

০.০০৮০ পাউন্ড। এই হিসেবে টাকা দিয়ে পাউন্ড পাওয়া যাবে। এটি হলা টাকার সাথে পাউন্ডের বিনিময় হার। আমেরিকান ডলারের ক্ষেত্রে এই হার হল ১ টাকা = ০.০১১ ডলার। এভাবে নির্ধারিত হয় টাকার বহির্মূল্য । উপরের দুই মুদ্রার সাথে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, টাকার তুলনায় পাউন্ড ও ডলার অনেক বেশি শক্তিশালী মুদ্রা। ঘুরিয়ে বলা যায়, এই দুই মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় রুপী খুবই দুর্বল। বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেমন বিভিন্ন বাজারি শক্তির প্রভাবে উঠানামা করে তেমনি দুইটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারও ক্রমাগত পরিবর্তন হয়। এখন, ১ ডলার = ৯৪.৩৬ টাকা কিছু দিন আগেও ১ ডলার সমান ৮৫ টাকা ছিল। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমছে। টাকা আরো দুর্বল হচ্ছে। দামের এই পতনকে টাকার অবমূল্যায়ন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, টাকার মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। টাকার মূল্যহ্রাস হল দেশের অর্থনীতির দুরাবস্থার প্রধান উপসর্গ। গত এক বছরে টাকার ৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটেছে। এশিয়ার দুর্বলতম মুদ্রায় আখ্যায়িত হয়েছে টাকা। স্বভাবত প্রশ্ন উঠে, কেন এই পতন? টাকার দামের লাগাতর পতনের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে । গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব বানিজ্যে ভারত ক্রমাগত পিছু হটছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। আন্তর্জাতিক বানিজ্যে ভারতের ভবিষ্যত প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে। দেশের বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে, পেট্রোলিয়াম, সোনা, সার, রান্নার গ্যাসের আমদানি দিন দিন বাড়ছে। এই আমদানির বিল মিটাতে ডলারের চাহিদা প্রভূত পরিমানে বেড়ে চলছে । আর চাহিদার টানে ডলারের মূল্য বেড়ে চলছে। উল্টোদিকে মূল্য হ্রাস পাচ্ছে টাকার। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাজ নেই, রোজগার নেই। হাতে টাকাও নেই। এই মিনমিনে বাজারে বিনিয়োগ ঢালতে অনাগ্রহী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা। তারা স্টক ও ঋণের বাজার থেকে ক্রমাগত অর্থ তুলে নিচ্ছে। বিদেশী মূলধনের ঢালাও বহিঃগমণ ঘটছে। এর নেতিবাচক প্রভাবে টাকার রেকর্ড অবনমন হচ্ছে।

টাকার দামের এই পতনের বিরুপ প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। আম জনতার দৈনন্দিন জীবনযাপনেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। মুদ্রাস্ফীতি মাথাছাড়া দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার ব্যায় হূ হূ করে বাড়ছে। কল-কারখানার উৎপাদন কমছে। নিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি শ্রমিক ছাঁটাইও করছে শিল্পসংস্থাগুলি। সব মিলিয়ে আর্থিক দুর্গতি আরো চরমে পৌঁচেছে।

১৯৪৭ মার্চেই দলনির্বিশেষে হিন্দু মধ্যবিত্তের রায়- বাংলা ভাগ, ইতিহাস শিক্ষার বিড়ম্বনা

-পার্থ চট্টোপাধ্যায়

[ইতিহাস বিকৃতি ফ্যাসিবাদীদের বরাবরের অস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছে ইতিহাসের চরম বিকৃতি। উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। পশ্চিম বাংলার 'জনক' হিসেবে ইতিহাসের চরম বিকৃতি সাধন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে তুলে ধরার কু-প্রচেষ্টা চলছে। ইতিহাসের অমার্জনীয় বিকৃতির বিরুদ্ধে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি একটি অমোঘ পাঠ। আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধটি পুন:মুদ্রিত করা হল।]

কদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের নেতাদের মুখে সঠিক ইতিহাস মনে রাখার আবশ্যকতা নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শোনা যাচ্ছে। তারই মধ্যে সোহরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউ-এর নাম পরিবর্তন বিভ্রাট দেখিয়ে দিল, ঐতিহাসিক তথ্য যাচাই না করে প্রচলিত গালগল্পের ভিত্তিতে হুকুম জারি করলে হাস্যকর ভুল হয়ে যায়। যদিও নেতারা যে সেজন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত, তা মনে হচ্ছে না। যাই হোক, বিজেপি নেতাদের ইতিহাসতত্ত্ব আলোচনার উপলক্ষ অবশ্য ছিল ২০ জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেই আলোচনাও নানা বিকৃতি, অর্ধসত্য আর অজ্ঞতার কাঁটায় জর্জরিত।

২০ জুন ১৯৪৭ তারিখে বাংলার আইনসভায় একটি নয়, তিনটি ভোট হয়। প্রথমে সব সদস্যের ভোটে ১২৬-৯০ ব্যবধানে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে অবিভক্ত বাংলা নতুন পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দেবে। দ্বিতীয় ভোট হয় কেবল অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যদের মধ্যে। তাঁরা ৫৮-২১ ভোটে পৃথক প্রদেশ হিসেবে ভারতের সাংবিধানিক পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তৃতীয় ভোটে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সদস্যরা ১০৭-৩৪ ভোটে রায় দেন যে বাংলা অবিভক্ত থাকবে এবং পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদে যুক্ত হবে। সাম্প্রতিক প্রচারে কেবল দ্বিতীয় ভোটটির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেটি ছিল কেবল পশ্চিমবঙ্গের সদস্যদের ভোট। এদিকে বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন পশ্চিম আর পূর্ব মিলিয়ে ৯০-৯২ জন হিন্দু সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮৪ জন কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতেছিলেন। আর ছিলেন চার জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এক জন ভারতীয় খ্রিস্টান, এক জন নির্দল (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) আর তিন জন কমিউনিস্ট (জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়)। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পঁচিশ জন তফসিলি সদস্য। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যিনি বলতেন বর্ণহিন্দুর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নমশূদ্রদের পাকিস্তানে বাস করাই শ্রেয়, তিনি মাত্র পাঁচ জন শেডিউলড কাস্টস ফেডারেশন সদস্যকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। সুতরাং এই ভোটে দলনির্বিশেষে বাঙালি হিন্দুর মত ছিল বাংলা ভাগের পক্ষে।

এই ঐকমত্য এক দিনে তৈরি হয়নি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তার আগে অন্তত মাস ছয় ধরে একটি 'বঙ্গবিভাগ আন্দোলন' দানা বাঁধছিল। বাংলা ভাগের দাবিতে প্রচার আর জনমত সৃষ্টির জন্য বেঙ্গল পার্টিশন লিগ নামে একটি সংগঠনও তৈরি হয়।

মনে রাখতে হবে, এই সময় ভারত আর পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব আদৌ ওঠেনি। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান, যেখানে সুপারিশ করা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা আর যোগাযোগ ব্যবস্থার তদারকি করবে। তার নীচে থাকবে তিনটি প্রাদেশিক গ্রুপ- -প্রথমটিতে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ছয়টি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, দ্বিতীয়টিতে পশ্চিমের চারটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, আর তৃতীয়টিতে বাংলা ও অসম। প্রতিটি গ্রুপের স্বতন্ত্র সাংবিধানিক পরিষদ গঠিত হবে। এই সুপারিশ, কার্যকর হলে বাংলার হিন্দুরা একটি মুসলিম-নির্ধারিত সাংবিধানিক ব্যবস্থার কবলে পড়বে, এই আশঙ্কাতেই বাংলা ভাগের দাবি উঠেছিল।

১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার পরিণতি যা-ই হোক না কেন, ৩০ জুন ১৯৪৮-এর মধ্যে ব্রিটেন ভারত ছেড়ে চলে আসবে। এই ঘোষণার পরই বঙ্গবিভাগ আন্দোলন জোরকদমে এগোতে থাকে। ২২ ফেব্রুয়ারি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি বিবৃতিতে বলেন, বাংলার হিন্দুদের দাবি করা উচিত যে ব্রিটিশ শাসকেরা যেন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। অন্যথা একটি পৃথক সাংবিধানিক গ্রুপে থাকলে বাংলার হিন্দুরা স্থায়ী দাসত্বে বাঁধা পড়বে।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে বাংলার হিন্দু মহাসভা কিন্তু এই সময় খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিল। ১৯৪৫-৪৬ এর নির্বাচনে ছাব্বিশটি অমুসলিম আসনে। তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয়। এক জনও জেতেনি। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আসন থেকে শ্যামাপ্রসাদ নির্দল হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

গোটা মার্চ মাস জুড়ে প্রধানত কলকাতা, তার পার্শ্ববর্তী জেলা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া আর বীরভূমে বাংলা ভাগের দাবিতে দেড়শো-দু'শো সভা হয়। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার পাতায় দেখছি, প্রতি দিন বিভিন্ন জেলার রাজনৈতিক দল, বার অ্যাসোসিয়েশন, সাংস্কৃতিক সংগঠন অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকা সভার খবর। এর মধ্যে কিছু বড় আকারের জনসভা। রাজনৈতিক উদ্যোগ ছিল জেলা স্তরের কংগ্রেস নেতাদের হাতে। সরকারি রিপোর্টে বঙ্গ বিভাগের দাবিতে রাজনৈতিক দলের ডাকা ৭৬টি প্রকাশ্য সভার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে ৫৯টি কংগ্রেসের ডাকা, বারোটি হিন্দু মহাসভার, আর পাঁচটি দুই দলের যৌথ উদ্যোগ। এই সময় বঙ্গবিভাগের দাবিতে একটি পিটিশন আন্দোলনও পরিচালনা করেন বাংলার কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেস সভাপতি জে বি কৃপালনীকে উদ্দেশ করে লিখিত এই পিটিশনগুলির ৭০ ভাগ এসেছিল বর্ধমান ডিভিশনের জেলাগুলি থেকে। বস্তুত এই বিষয়ে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না, বরং যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। যেমন ১৫ মার্চ কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে শ্যামাপ্রসাদের সভাপতিত্বে এক সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বক্তৃতা করেন হিন্দু মহাসভার ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমপ্রভা মজুমদার। দলীয় উদ্যোগের বাইরে হিন্দু পেশাদার মধ্যবিত্তের নানা অংশ থেকেও বঙ্গ বিভাগের দাবি ওঠে, বিশেষত আইনজীবী মহল থেকে। ১২ মার্চ কলকাতা হাই কোর্টের পঞ্চাশ জন হিন্দু ব্যারিস্টার এবং তিন দিন পর শতাধিক হিন্দু সলিসিটর বিবৃতি দিয়ে বাংলা ভাগ দাবি করেন। পশ্চিমের জেলাগুলির প্রতিটি বার অ্যাসোসিয়েশন একই দাবি করে। সুতরাং মার্চের মধ্যেই কলকাতা ও পশ্চিমের জেলাগুলির হিন্দু মধ্যবিত্ত যে দলনির্বিশেষে বাংলা ভাগের পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু নেতা নেতাদের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ছিল। ২২ ফেব্রুয়ারির এক বিবৃতিতে ত্রিপুরা (কুমিল্লা), নোয়াখালী, বরিশাল আর বগুড়া জেলার বেশ কয়েক জন এমএলএ, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ব্যবসায়ী বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে বলেন, এই প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী আন্দোলন আসলে মুসলিম লিগের বিভাজন নীতিকেই মেনে নিচ্ছে। এর ফলে পূর্ববঙ্গের অন্য হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ করে তফসিলি হিন্দুদের স্বার্থ গুরুতর ভাবে ব্যাহত হবে। এই আশঙ্কা দূর করার জন্য বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের পক্ষ থেকে বারে বারে বলা হতে লাগল যে, বাংলার পশ্চিমে হিন্দুপ্রধান অংশে যদি ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়, তবে তা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। ১৯ মার্চ এক দীর্ঘ বিবৃতিতে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, পৃথক প্রদেশ গঠিত হলে বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু সেখানে নির্বিঘ্নে বাস করতে পারবে। ভারতীয় ইউনিয়ন ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের শক্তিতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুও সুরক্ষিত থাকবে। "ব্যবচ্ছেদ কথাটিতে ভীত হইয়া মূর্চ্ছা যাওয়া আমাদের উচিত নহে”। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস দল ঘোষণা করেছে যে কোনও অনিচ্ছুক অঞ্চলের উপর শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সুতরাং বঙ্গবিভাগ এখন সর্বদলীয় বিষয় হয়ে গেছে।

কিছু দিন আগে কর্মসূচিতে বিজেপি দাবি করেছে যে, এপ্রিল ১৯৪৭-এ তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলন থেকেই শ্যামাপ্রসাদের দেওয়া ডাকে যে জনমত গড়ে ওঠে, তার চাপেই পৃথক পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই ঘটনা স্মরণ করে ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারকেশ্বরে জনসভা করেন। ইতিহাস ঘাটলে কিন্তু তারকেশ্বরের হিন্দু সম্মেলনের বিশেষ কোনও তাৎপর্য দেখতে পাওয়া যায় না। ওই সম্মেলনে

শ্যামাপ্রসাদ সভাপতিত্ব করেননি, করেছিলেন হিন্দু মহাসভার আর এক শীর্ষস্থানীয় নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৪ এপ্রিলের বক্তৃতায় তিনি বঙ্গবিভাগের দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। শ্যামাপ্রসাদ ওই দিন ছিলেন কলকাতায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে। সেই সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বাংলার কোনও অংশ যদি পৃথক হয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ হতে চায়, তা হলে তাকে সেই অধিকার দিতে হবে। এই প্রস্তাব দিল্লিতে নেহরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। পর দিন শ্যামাপ্রসাদ তারকেশ্বরে যে বক্তৃতা করেন, তা নতুন কিছু নয়, বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের পরিচিত বক্তব্য। অর্থাৎ এই আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেই ভূমিকা এই আন্দোলনের নির্ণায়ক ছিল, এ কথা বললে বড় রকমের অত্যুক্তি হয়।

গত সপ্তাহে তারকেশ্বরের সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, যখন পুরো বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার চেষ্টা হচ্ছিল, তখন কংগ্রেস নাকি ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ছিল। বিভাজনের সময়ে বাংলাকে অবহেলায় ফেলে রাখতে চেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে অর্ধসত্যও বলা চলে না- তা সর্বৈব অসত্য। বাংলা ভাগের প্রশ্নে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বা হিন্দু মহাসভার কোনও মতদ্বৈধ ছিল না। মার্চ মাস থেকেই রাংলার কংগ্রেস নেতারা সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের কাছে বাংলা ভাগের দাবি সমর্থন করার আর্জি জানাচ্ছিলেন। ২৬ মার্চ দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাংলার অমুসলমান সদস্যদের একটি বৈঠকে স্থির হয়, সাম্প্রদায়িক নিষ্পেষণ থেকে জাতীয়তাবাদী বাংলাকে রক্ষা করার জন্য বাংলা বিভাগ এবং একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন আবশ্যক। এর ক'দিন পরেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস বাংলা বিভাজনের দাবিকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৪৭-এর মে মাসে শরৎচন্দ্র বসু ও শহিদ সোহরাওয়ার্দি বাংলার অখণ্ডতা রক্ষা করে স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কংগ্রেস অথবা মুসলিম লিগ কোনও পক্ষ থেকেই সমর্থন পাওয়া যায় না। ২৭ মে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী দু'জনেই বলেন, যুক্ত বাংলা তবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি তা সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। জনসাধারণের দিক থেকেও এই প্রস্তাবের পক্ষে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় না। এর পর শরৎ বসু নিজেই এই প্রস্তাব থেকে সরে আসেন।

৩ জুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন রেডিয়ো ভাষণে ঘোষণা করেন, ১৫ অগস্ট ভারত আর পাকিস্তান, দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হবে। বঙ্গীয় আইনসভায় ২০ জুনের ভোটের পর বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হয়ে যায়। এর পর আসে র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সীমান্ত নির্দিষ্ট করার পালা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর সংগঠনের কাছ থেকে প্রস্তাব চেয়ে পাঠানো হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস এক বিশেষ কমিটি গঠন করে যার সভাপতি হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সেক্রেটারি নির্মলকুমার বসু। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অর্থনীতিবিদ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূগোল-বিশেষজ্ঞ এস পি চট্টোপাধ্যায়। এই কমিটির পক্ষ থেকে অতুল চন্দ্র গুপ্ত বাংলা বিভাজনের যে স্কিম দেন, তা মোটামুটি র‍্যাডক্লিফের চূড়ান্ত সীমানারই অনুরূপ। ভাগীরথী-সহ দক্ষিণ বাংলার নদীগুলির উৎসমুখ ভারতে রাখার জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গে রাখার দাবি জানানো হয়। বদলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলা ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য দিকে, হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকেও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার অবাস্তব দাবি ছিল। এই প্রস্তাব রচনায় শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় না। ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট তিনি দিল্লিতে নেহরুর মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

২০ জুন ১৯৪৭-এ আইনসভার ভোট যে ঐতিহাসিক, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। এই ভোট প্রমাণ করে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুই সর্বান্তঃকরণে বাংলার বিভাজন চেয়েছিল। আর কেউ তার জন্য দায়ী নয়। পরবর্তী ইতিহাস থেকে এটাও প্রমাণিত যে ভারতে অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষাকবচ হবে, শ্যামাপ্রসাদ এবং অন্য নেতাদের এই আশ্বাস ভুল ছিল। স্বাধীনতার পর দুই দশকে অন্তত আশি লক্ষ বাস্তুহারা পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তাঁদের মধ্যে একটা অংশ নানা মধ্যবিত্ত পেশায় উপার্জনের ব্যবস্থা করে নেন। আর একটি অংশ কলকাতা আর শহরতলিতে জবরদখল কলোনি স্থাপন করেন। আরও একটি অংশকে যেতে হয় ক্যাম্পে, দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে। এগুলিও সেই ২০ জুনের ভোটের পরিণাম। সুতরাং ঐতিহাসিক হলেও সেই দিনটি ধুমধাম করে স্মরণ করার যোগ্য কি না, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন থেকে যায়। ইতিহাসের শিক্ষা প্রায়শই সরল হয় না।

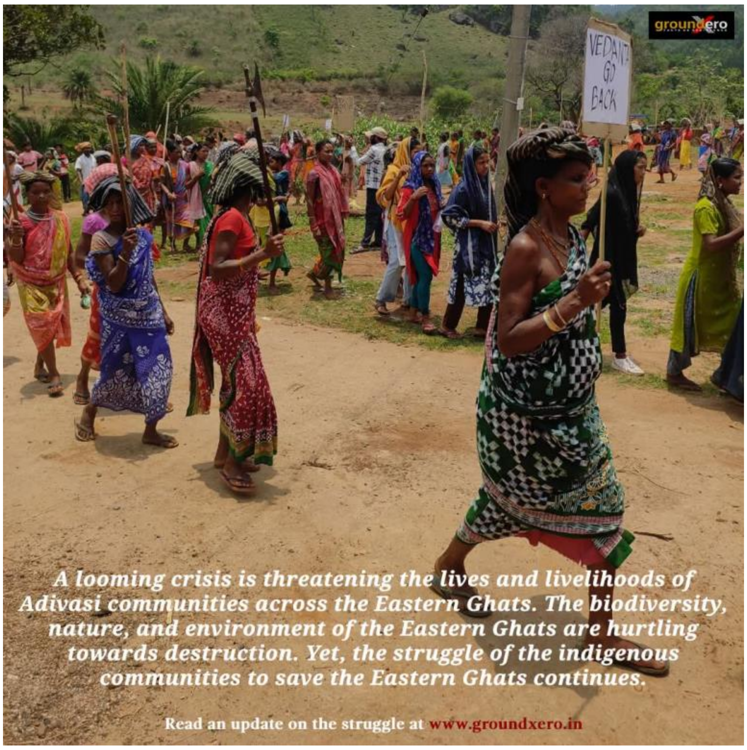

সিজিমালী পাহাড়ের গর্জন
বেদান্ত তুমি দূর হটো

- মিহিরলাল রায়

এই জল-জঙ্গল-জমিন আমার, আমাদের। আমরা এখানকার আদিবাসী, ভূমি - পুত্র। এ জমিন আমাদের মা, এ জঙ্গল আমাদের মা। জান দিতে হয় দেব, তবু আমরা আমাদের মাকে ছাড়ব না।

--- বিরসা মুন্ডা

"গাঁও ছোড়ব নেহি, জঙ্গল ছোড়ব নেহি/ মায়-মাটি ছোড়ব নেহি, লড়াই ছোড়ব নেহি/# বাঁধ বানায়ে, গাঁও ডোবায়ে, কারখনো বানায়ে, জঙ্গল কাটে, খাদান খোটে, ফ্যাক্টরি বানায়ে, জল জঙ্গল জমিন ছোড়ি হামিন কাহা যাও---।" গানটি ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার ও প্রতিরোধের বিখ্যাত এক প্রতিবাদী গান। উড়িষ্যা সহ সমগ্র ভারতের আদিবাসীদের জল-জঙ্গল-জমিন রক্ষার লড়াইয়ে এই গানটি এক অনন্য প্রতীক। বনভূমি ধ্বংস, অবৈধ খনি ও বড়ো বড়ো বাঁধ বা কারখানার নামে আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত করার

প্রতিবাদে এই গানের জন্ম। গানটি প্রথম গেয়েছিলেন উড়িষ্যার কাশীপুরের তরুণ আদিবাসী নেতা ভগবান মাঝি। পরবর্তীতে প্রখ্যাত পদ্মশ্রী পাওয়া শিল্পী মধু মানসুরী হাসমুখ এবং অন্যান্য শিল্পীদের কণ্ঠে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমরা গ্রাম ছাড়বো না, জঙ্গল ছাড়বো না, মাটি ছাড়বো না, লড়াই ছাড়বো না" - এই দৃঢ় সংকল্পই এই গানের মূল ভিত্তি। এযেন ঝাড়খন্ডের সেই আদিবাসী নেতা, বিরসা মুন্ডারই উত্তরাধিকার। যে বিরসা মুন্ডা পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ভূমি নীতির বিরুদ্ধে ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের ভূমিকে মালিকী সম্পত্তিতে পরিণত করার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রকৃতি-পরিবেশ প্রশ্নেও সতর্ক করে উচ্চারণ করেন "যে সমাজ প্রকৃতিকে ভুলে যায়, সে সমাজ নিজেকে ধ্বংস করে।"

শুরুতেই যে গানটির কথা বললাম, সেটি উড়িষ্যার কালাহান্ডি ও রায়গড় জেলার সিজিমালী পাহাড়ে বক্সাইট খনির বিরুদ্ধে উচ্চারিত দীপ্ত আওয়াজ। কারণ, সংশ্লিষ্ট আদিবাসীরা মনে করে, বেদান্তের এই খনির জন্য তাদের এলাকার জলের উৎসগুলো শুকিয়ে যাবে। বন ধ্বংস হবে। পাশের কৃষি জমি অনুর্বর হবে। বাতাসে বিষ ছড়াবে। ঐতিহ্যবাহী জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারাও হবে বাস্তচ্যুত। এজন্যই সে অঞ্চলের আদিবাসীরা দেশের অন্যতম বৃহত্তম খনি সংস্থা বেদান্ত লিমিটেড এর বক্সাইট খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

পূর্বঘাট পর্বত মালার একটি অংশ এই সিজিমালী পাহাড়। কালাহান্ডির ভবানী পাটনা থেকে পয়ষট্টি কিলোমিটার দূরত্বের এই পাহাড় অঞ্চলটি তার উর্বর মালভূমি, সবুজ অরণ্য এবং প্রচুর জলপ্রপাত ও ঝরণার জন্য বিখ্যাত। স্থানীয়দের কাছে এটি 'তিজমালী' নামেও পরিচিত। এখান থেকে উৎপন্ন নদী এবং ঝরনাগুলো আশেপাশের জমিতে জল সেচের প্রধান উৎস। ওই পাহাড়ের নীচে লুকিয়ে আছে বক্সাইট খনিজ ভান্ডারও, যার দিকে শ্যেনদৃষ্টি বেদান্তের। তা নিয়েই প্রতিবাদে উত্তাল সেখানকার আদিবাসীরা। সম্প্রতি প্রকল্পের পরিবেশগত

ছাড়পত্র এবং আইনী প্রক্রিয়া নিয়ে ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনালে মামলা চলাকালীনই সরকারের বনবিভাগ থেকে খনি অভিমুখে রাস্তা নির্মাণে অনুমতি দিলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। ক্ষেপে যায় সরকার। সংবাদে প্রকাশ ৭ এপ্রিল ভোর রাতে সশ্রস্র পুলিশ কান্ডমোল গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামবাসীরা যখন গভীর ঘুমে, পুলিশ দরজা ভেঙে ঝাপিয়ে পড়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের উপর। প্রতিবাদী নেতা-নেত্রীদের গ্রেপ্তারও করে। এতে গ্রামবাসীরা বিক্ষুব্দ হয়ে তাড়া করে পুলিশ বাহিনীকে। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথরও ছুড়তে, আরম্ভ করে। এতে পুলিশ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। লাঠিচার্জ করে, শূণ্যে গুলি চালায়, কাঁদানে গ্যাসও নিক্ষেপ করে। পুলিশ ও আদিবাসীদের এই সংঘর্ষে সত্তরজনেরও বেশি আহত হন। সব মিলিয়ে এলাকা জুড়ে এখন, মানুষের ক্রোধের উচ্চারণ - মাটি আমরা ছাড়বো না, বেদান্ত তুমি পাততাড়ি গুটাও।

২০২৩ সালের মার্চে সরকার বেদান্ত লিমিটেডরে এই পাহাড়ে বক্সাইট খনি প্রকল্পের জন্য এক হাজার পাঁচশ উনপঞ্চাশ হেক্টর জায়গা পঞ্চাশ বছরের ইজারায় বরাদ্দ করেছে। একটা বড় অংশই বনভূমি। পরিমাণ প্রায় সাতশ হেক্টর। সেখানে মজুত তিনশ এগারো মিলিয়ন টন বক্সাইট উত্তোলন করবে বেদান্ত। তাদের লান্ডিগড় নিকটবর্তী পাঁচ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষম অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরীতে কাঁচামাল সরবরাহ করতে। এই খনি থেকে বক্সাইট. উত্তোলন হবে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে। পাহাড়ের উপরের মাটি, গাছ-পালা, শিলাস্তর সরিয়ে ধাপে ধাপে বক্সাইট পৌঁছানো হবে। খনন শুরুর আগেই পাহাড়ের ভূ-প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে। কারণ, অরণ্য নিধন, মাটি সরানো, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শিলাস্তর ভাঙা। সাথে খনি এলাকায় মাতোয়াদের রাস্তা নির্মাণ এবং গোদামসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ। এসবে বায়ুদূষণের সম্ভাবনা আছে। একদিকে ধুলো, অন্যদিকে যন্ত্র ও যানবাহন নির্গত বায়ুদুষণ ঘটাবে। শব্দ

দূষণ ও হবে। কারণ, বিস্ফোরণের: শব্দ, ড্রিল মেশিনের আওয়াজ, জন কোলাহল।

সরকারী পরিবেশ কমিটি ছাড়পত্র দিলেও, পরিবেশবিদরা মনে করেন, এই প্রকল্প এই পাহাড়ী অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের জন্য হবে ক্ষতিকর। তার ক্ষতিকারক প্রভাব শুধুমাত্র সিজামালী পাহাড়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা পূর্বঘাট অঞ্চলকেই বিপন্ন করে তুলবে। ওই অঞ্চলে প্রধানত কন্ধসহ বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস, তারা বলছেন - তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হবে, ভূমি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হবেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও হারাবেন। অরণ্য থেকে তারা মহুয়া, শাল-পাঁতা, তেঁতুল, বিভিন্ন হলদি সহ বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে আসছেন। এগুলোর কিছু তাদের পরিবারের প্রয়োজন মেটায়। বাকিটা বাজারে বিক্রি করে আয়ও হয়। তা বন্ধ হবে। সরকার অবশ্য বলছে, ওদের কর্মসংস্থান হবে। তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। সকলের কর্মসংস্থান ? যারা মাঠ পর্যায়ে এসব প্রকল্পের কারণ বাস্তূচ্যুত, জীবিকা হারানো মানুষদের খবরা খবর রাখেন, তারা কিন্তু জানেন নীট ফলটা কী হয়। কিছুটা কর্মসংস্থান হয়ত হবে, কিন্তু এত বিশাল এলাকার অরণ্য নিধন, বাস্তুতান্ত্রিক ক্ষয়-ক্ষতি, জল ও কৃষিজমি হারানোর যে ক্ষতি তা হবে অনেক অনেক গুণ বেশি। তারা এবং পরিবেশবিদেরা বলছেন, এরকম উন্নয়ন ভাবনাটাই বড় গোলমেলে। মুনাফাখোড়দের পাইয়ে দিতে বেশিরভাগ মানুষকে বিপর্যয়ে ঠেলে দেওয়া। যদি উন্নয়ন মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেয়, যদি প্রাকৃতিক ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে, তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় কেড়ে নেয়, তা হলে তা মোটেই কাম্য নয়। যা, আজকের সময়ে হতে চলছে সিজিমালীর পাহাড়ে।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এই অঞ্চলটি তফশিলি এলাকার অন্তর্গত। এ ধরণের প্রকল্পে ছাড়পত্র দেবার আগে মতামত নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ, এ ক্ষেত্রে সরকার ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। এজন্যও এলাকার

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ, গণবিক্ষোভ। অনেকটা যেন বহু খ্যাত নিয়মগিরি পাহাড়ের আন্দোলনের সাথেই তুলনীয়। সেখানেও বেদান্তের বক্সাইট উত্তোলন খনি হবার কথা ছিল। তার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল ডংরিয়া কন্ধ আদিবাসীদের ঐতিহাসিক পরিবেশ ও মানবাধিকার আন্দোলন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং সারভাইকভাল ইন্টারন্যাশনাল এর মতো মানবাধিকার সংস্থাগুলোও একে সমর্থন জানায়। ২০১৩ সালে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এক যুগান্তকারী রায়ে স্থানীয় গ্রাম সভাগুলিকে খনির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। হয় গণভোট। বারোটি গ্রামের আদিবাসীরা পাহাড় খননের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। পাহাড় বেঁচে যায়। আদিবাসী অধিকার, পরিবেশ রক্ষা ও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আজকের সময়ে গোটা দেশের মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন। সিজিমালী পাহাড়ের আদিবাসীদের আন্দোলনের দিকে। সিজিমালী পাহাড়ের আদিবাসীরা কী তাদের পাহাড় বাঁচাতে পারবেন কর্পোরেট হাঙারের লিপ্সা থেকে? আমাদের আশা করতে মন চায়। তাই আমাদের উচ্চারণ - বেদান্ত তুমি দূর হটো।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিবেশগত কিছু প্রশ্ন

- **দীপ্রদীধিতি রায়বর্মণ**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বর্তমানে এ আই নামে খুব দ্রুত একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বিকাশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ একে নতুন শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলি একে ভবিষ্যতের উৎপাদনশীলতা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র বলে প্রচার করছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের গবেষণা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেন্দ্রিক করে পুনর্গঠিত করছে। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। জটিল প্যাটার্ন শনাক্ত করতে পারে। লেখা ও ছবি তৈরি করতে পারে। ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারে এবং ক্রমশ জটিল কাজকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ুবিজ্ঞান সম্পর্কিত ক্ষেত্রেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ছে যেমন নবীকরণযোগ্য শক্তির পূর্বাভাস, দুর্যোগের সম্ভাবনা নির্ণয়, মিথেন গ্যাস নিঃসরণ শনাক্তকরণ এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনাইটেড ন্যাশানস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম) উল্লেখ করেছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জলবায়ু অভিযোজন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাই বহু সম্ভাবনাময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঘিরে জনসমাজে যে আলোচনা গড়ে উঠেছে তা মূলত দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এর বিপরীতে, এই প্রযুক্তিগত বিস্তারের পেছনে যে বিশাল ভৌত অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, তার পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে আলোচনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে বিশাল ডেটা সেন্টার, বিপরীতে, এই প্রযুক্তিগত বিস্তারের পেছনে যে বিশাল ভৌত অবকাঠামো কাজ করছে, তার পরিবেশগত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসর, কুলিং সিস্টেম, বিদ্যুৎ গ্রিড এবং খনিজ ও ইলেকট্রনিক উপাদানের বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার উপর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার যত বাড়ছে, এই অবকাঠামোর পরিবেশগত প্রভাবও তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের দীর্ঘদিন ধরে প্রধান লক্ষ্য ছিল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ছদ্মবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা। সেই সংগ্রামের গুরুত্ব এখনও অটুট। কিন্তু বর্তমান সময়ে অযৌক্তিকতা শুধু পুরোনো কুসংস্কারের রূপে উপস্থিত হয় না। তা প্রযুক্তিকে ঘিরে অন্ধ আশাবাদের মধ্যেও প্রকাশ পায়। এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে প্রতিটি নতুন প্রযুক্তিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজের অগ্রগতি ঘটায়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নিজেই সমস্ত সংকটের সমাধান করে দেবে। অথচ একটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বাধ্য করে প্রযুক্তির সম্ভাবনার পাশাপাশি তার পরিবেশগত মূল্য, বস্তুগত নির্ভরতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে।

এই কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে জনগণের মধ্যে নিবিড় আলোচনা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) র তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ডেটা সেন্টারগুলি প্রায় ৪১৫ টেরাওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে যা বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রায় ১.৫ শতাংশ। সংস্থাটি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিস্তারের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে ডেটা সেন্টারগুলির বিদ্যুৎ চাহিদা ১,০০০ টেরাওয়াট-ঘণ্টা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই পরিসংখ্যান আমাদের বাধ্য করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঘিরে প্রযুক্তিগত উন্মাদনার বাইরে গিয়ে আরও গভীর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে আমরা কেমন প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছি, তার পরিবেশগত মূল্য কতটা? সমস্যাটি শুধু এই নয় যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে; বরং এর দ্রুত বিস্তার এমন এক বিশ্বে ঘটছে, যা ইতিমধ্যেই জলবায়ু অস্থিরতা, সম্পদের অসম বণ্টন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতার সংকটে জর্জরিত। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) সতর্ক করেছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশগত প্রভাব শুধু বিদ্যুৎ ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ডেটা সেন্টারের বিস্তার ইলেকট্রনিক বর্জ্যের পরিমাণ বাড়াচ্ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। উন্নত কম্পিউটিং ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের সেমিকন্ডাক্টর ও বিরল খনিজ, যেগুলির খনন প্রক্রিয়া প্রায়ই বন ধ্বংস, জলদূষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, মাত্র দুই কেজি ওজনের একটি কম্পিউটার তৈরি করতে প্রায় ৮০০ কেজি কাঁচামাল প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশগত মূল্য শুরু হয় অনেক আগেই যখন প্রযুক্তিটি ব্যবহারের পর্যায়েও পৌঁছায়নি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামো থেকে উৎপন্ন ইলেকট্রনিক বর্জ্যও একটি গুরুতর সমস্যা। সার্ভার, প্রসেসর ও কুলিং সিস্টেমের আয়ু সীমিত; প্রযুক্তিগত চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দ্রুত বদলাতে হয়। এই বর্জ্যের মধ্যে পারদ, সীসার মতো বিষাক্ত উপাদান থাকে, যা দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বিশ্বের বহু অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত পুনর্ব্যবহার শিল্পে শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষ ইতিমধ্যেই এই বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামো বিস্তারের কারণে সংকটকে আরও তীব্র করতে পারে।

তাছাড়া জল ব্যবহারের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা প্রায়শই আলোচনার বাইরে থেকে যায়। ডেটা সেন্টার নির্মাণ ও পরিচালনার সময় বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং ব্যবস্থাকে ঠাণ্ডা রাখতে। গবেষণা থেকে দেখা গেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত অবকাঠামো ভবিষ্যতে বছরে ডেনমার্কের মতো একটি দেশের তুলনায় ছয় গুণ বেশি জল ব্যবহার করতে পারে। তা এমন এক পৃথিবীতে, যেখানে এখনও প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই তথ্য গভীর উদ্বেগজনক। যেসব অঞ্চল ইতিমধ্যেই খরা, ভূগর্ভস্থ জলের ঘাটতি বা অতিরিক্ত তাপমাত্রার সমস্যায় ভুগছে, সেখানে ডেটা সেন্টারের প্রসার জলের উপর সংঘাত আরও বাড়াতে পারে। পরিবেশবান্ধব বলে প্রচারিত কিছু প্রযুক্তিগত সমাধানও নতুন ভাবে আরো অনেক পরিবেশগত প্রশ্ন তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোসফটের পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট ন্যাটিক (প্রজেক্ট ন্যাটিক)-এর মতো জলের নিচের ডেটা সেন্টারগুলিকে এমন এক বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যা কুলিং-এর জন্য কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু গবেষকরা সতর্ক করেছেন যে এই ধরনের অবকাঠামো থেকে নির্গত তাপ সামুদ্রিক পরিবেশের স্থানীয় তাপমাত্রা বাড়িয়ে অক্সিজেনের প্রাপ্যতা কমিয়ে দিতে পারে। খাদ্যশৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রায়শই পুরোনো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নতুন পরিবেশগত জটিলতার জন্ম দিচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামোর জলবায়ুগত প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্বের অধিকাংশ বিদ্যুৎ এখনও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। ডেটা সেন্টারগুলোকে সারাক্ষণ চালু রাখতে বিপুল ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, আর বহু দেশে সেই বিদ্যুৎ এখনও কয়লা, তেল ও গ্যাস থেকেই উৎপাদিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, চ্যাটজিপিটি-তে একটি অনুরোধ পাঠাতে সাধারণ গুগল সার্চের তুলনায় প্রায় দশ গুণ বেশি বিদ্যুৎ খরচ হতে পারে। ব্যক্তিগতস্তরে এটি সামান্য মনে হলেও, বৈশ্বিক পরিসরে এর সম্মিলীত প্রভাব বিশাল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারের সাথে বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টারের সংখ্যাও দ্রুত বেড়েছে। ২০১২ সালে যেখানে সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ, বর্তমানে তা প্রায় ৮০ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে। ইউরোপের অন্যতম প্রযুক্তিকেন্দ্র আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন গবেষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে কয়েক বছরের মধ্যেই ডেটা সেন্টারগুলি দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ৩৫ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। তবে এই বাস্তবতাগুলি কখনও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হতে পারেনা। যদি এমন হয় তবে সেটা হবে চূড়ান্ত সরলীকরণ এবং অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।

প্রযুক্তির ইতিহাস সবসময়ই দ্বৈত সম্ভাবনার ইতিহাস। যে প্রযুক্তি পরিবেশগত সংকটকে তীব্র করতে পারে, সেই প্রযুক্তিই আবার দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহৃত হলে জনকল্যাণ ও স্থায়িত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতিমধ্যেই নবীকরণযোগ্য শক্তির পূর্বাভাস, বিদ্যুৎ গ্রিডের দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জলবায়ু বিষয়ক গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। মিথেন গ্যাস নিঃসরণ শনাক্তকরণ, বন ধ্বংস পর্যবেক্ষণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনাতেও মেশিন লার্নিং কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তাই মূল প্রশ্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজে ভালো না খারাপ তা নয়; বরং সমাজ কীভাবে একে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও ব্যবহার করছে, সেটাই।

এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর শিল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়। তেল ও গ্যাস শিল্পে ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান, উত্তোলন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করে তুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ কমতে পারে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়তে পারে। যখন পৃথিবীর প্রয়োজন তার ঠিক উল্টো কার্বন নির্ভরতা কমানো। একইভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যানবাহন প্রযুক্তি গণপরিবহনকে শক্তিশালীও করতে পারে, আবার ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহারও বাড়াতে পারে। অর্থাৎ প্রযুক্তি: কখনো সমাজ ও রাজনীতির বাইরে কাজ করে না। সেই কাঠামোর মধ্যেই তার ব্যবহার নির্ধারিত হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে জৈবিক নকশা গঠন ও জৈব সুরক্ষা নিয়েও নতুন উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলি জিনপ্রযুক্তি বা ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ে বিপজ্জনক পরীক্ষার পথ সহজ করে দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে অনেক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল 'ব্ল্যাক বক্স' হিসেবে কাজ করে। যার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। ফলে জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে ওঠে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব গভীর হতে পারে।

এইসব উদ্বেগ সত্ত্বেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ এখনো অত্যন্ত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। উল্লেখ্য ১৯০টিরও বেশি দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহারের জন্য কিছু অ-বাধ্যতামূলক সুপারিশ গ্রহণ করেছে, যেখানে পরিবেশগত বিষয়ও উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু সীমিত নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপও নিয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির বিস্তারের গতির তুলনায় পরিবেশগত তদারকি এখনো অপর্যাপ্ত বলা চলে। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনার বড়ো অংশই গোপনীয়তা, ভুয়ো তথ্য বা

অ্যালগরিদমিক পক্ষপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শক্তি ব্যবহার, জল, ই-বর্জ্য বা কার্বন নিঃসরণ নিয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম আলোচনা হয়।

এই বিতর্কে ভারতের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল ডিজিটাল অর্থনীতিগুলির একটি হিসেবে ভারত একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামো ও নবীকরণযোগ্য শক্তি খাত সম্প্রসারণ করছে। এর মধ্যে যেমন ঝুঁকি রয়েছে তেমনি সুযোগও রয়েছে। যদি ডিজিটাল সম্প্রসারণ মূলত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ ও দুর্বল পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে এগোয়, তবে তার পরিবেশগত প্রভাব গুরুতর হতে পারে। কিন্তু যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবকাঠামোকে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তি, দক্ষ কুলিং ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ কার্বন নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে ভারত আরও দায়িত্বশীল প্রযুক্তিগত বিকাশের একটি বিকল্প মডেল তুলে ধরতে পারবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা শুধুমাত্র কর্পোরেট সংস্থা, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বা নীতিনির্ধারকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ বাঁচানো, বর্জ্য কমানো এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের কথা বলা হয়। অথচ বৃহৎ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার পরিবেশগত মূল্য প্রায়শই জনসমক্ষে আসে না। একটি ডেটা সেন্টার কত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে? সেই শক্তি কোথা থেকে আসে? কুলিং-এর জন্য কত জল লাগে? খনিজ উত্তোলনের ফলে কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয়? এই প্রশ্নগুলি জনপরিসরের আলোচনার অংশ হওয়া উচিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিবেশগত প্রভাব পূর্বনির্ধারিত নয়। তা নির্ভর করবে নীতি, শক্তির উৎস, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সম্পদ আহরণের পদ্ধতি এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার উপর।

মানবসমাজের সামনে তাই মূল চ্যালেঞ্জ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া নয় বরং তাকে দায়িত্বশীলভাবে পরিচালিত করা। বিজ্ঞান যদি শুধুমাত্র

আরও শক্তিশালী যন্ত্র তৈরির হাতিয়ার হয়ে ওঠে এবং সেই যন্ত্রের পরিবেশগত মূল্য উপেক্ষা করে, তবে তা মানবসভ্যতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে যদি শুধুমাত্র গতি, দক্ষতা ও বাজারমূল্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, তবে তা বৈষম্য, সম্পদসংকট ও পরিবেশগত অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু স্থায়িত্ব, গণতান্ত্রিক তদারকি ও জনকল্যাণের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রযুক্তি মানবজাতির সবচেয়ে বড় সংকটগুলির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জলবায়ু সংকটের যুগে মানুষের কাছে শুধু উন্নত প্রযুক্তি তৈরি করা মূল বিষয় নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো মানবসমাজের কাছে সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ আছে কি না, যার মাধ্যমে এই প্রযুক্তিগুলিকে পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা সম্ভব হবে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্ধ প্রযুক্তি বন্দনার বদলে প্রযুক্তির ফলাফলকে সততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে সুসংহত উন্নয়নের পথ নির্মাণ সহ মানুষ ও পৃথিবী উভয়ের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে।

বিচার বহির্ভূত হত্যা ও বিচার বহির্ভূত শাস্তির "নব্য স্বাভাবিকতায়" - হাজত হিংসায় বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু

- পুরুষোত্তম রায় বর্মন

জসিন্দর সিং, বয়স ৩৫, উচ্চতা ছয় ফুট, বিএসএফ জওয়ান, ব্যাটেলিয়ান নাম্বার ৪২, ত্রিপুরায় পোস্টিং। বাড়ি সীমান্ত গ্রাম, দেওয়ানগড়। জম্মু থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে। জসিন্দর ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। বাড়ি থেকে ত্রিপুরায় সীমান্ত প্রহরায় ফেরা হয়নি জসিন্দরের। ২০ মার্চ , ২০২৬, জসিন্দর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হন একটানা ১৭ দিনের হাজত হিংসায়। জসিন্দরের মৃত্যু নাকি আচমকা 'হৃদরোগের' কারণে। অমৃতসরের পালস হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী কুড়ি মার্চ ৩ঃ৩০ মিনিটে জসিন্দর আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। যখন তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় তখন তার রক্তচাপ ৯০/৪০ এবং নাড়ীর গতি ৩২ প্রতি মিনিট । জসিন্দরের মৃত্যুর খবর পেয়ে জসিন্দরের মা এবং স্ত্রী হাসপাতালে ছুটে

যায় জসিন্দরকে দেখতে। ততক্ষণে জসিন্দরের ঠাই হয়েছে হাসপাতালের মর্গে। মর্গে মা ও স্ত্রী জসিন্দরের মৃতদেহে দেখতে পায় অগুন্তি অত্যন্ত গুরুতর রক্তাক্ত জখম। রক্তে ভিজে গেছে মৃতদেহতে জড়ানো চাদর। মৃতদেহকে তুলে ধরতেই পিঠের নিচে রক্তাক্ত জখমগুলো সমবেত কন্ঠে চিৎকার করতে শুরু করে, হৃদরোগে মৃত্যু নয় ভয়াবহ হাজত হিংসার শিকার হয়েছে জসিন্দর। ইতিমধ্যে অসহায় স্ত্রী ও মার চিৎকার যেন ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। স্থানীয় গুরুদোয়ারার কমিটির সদস্যদের জানানো হয়। বিএসএফকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। " হৃদরোগে মৃত" জসিন্দরের দেহের রক্তাক্ত আঘাতের ছবিগুলো ভাইরাল হয়ে যায়। পোস্টমর্টেম করা হয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট মৃতদেহে ৩৪ টি আঘাত পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ১১ নম্বর আঘাতের পরিমাপ ২৭.৫ × ১৭.৫ সেন্টিমিটার। ১১ নম্বর আঘাতের স্থানের পেশিগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী নয়টি আঘাত কমপক্ষে ১৮ থেকে ২৪ ঘন্টা পুরনো। আঘাতের কারণে শরীরে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাই নাকের ভেতর জমাট বাঁধা রক্ত পাওয়া গেছে। জসিন্দরের ফুসফুস ও প্লীহাতে বাহ্যিক আঘাতের কারণে প্রচুর আভ্যন্তরীণ রক্তপাত হয়েছে।

১৭ দিন ধরে কারা জসিন্দরকে একটানা অত্যাচার করলো? ৩রা মার্চ জসিন্দর ও তার স্ত্রী লাভজিৎ বাড়ি ফিরছিল আত্মীয়র বাড়ি থেকে । বাড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে আনুমানিক বেলা চারটার সময় মিরান সাহেব এলাকায় নারকোটিক কন্ট্রোল বোর্ড আধিকারিকরা (এন সি বি) জসিন্দর ও তার স্ত্রীর গাড়ি আটকায়। তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে গাড়ি থেকে নামায়। রাস্তায় এক ঘন্টা ধরে জসিন্দরকে মারধর করে এনসিবির আধিকারিকরা। সংখ্যায় তারা ছিল সাতজন। অচৈতন্য জসিন্দরকে মারধরের পর পাজা গোলা করে এনসিবির গাড়িতে তোলা হয়। জসিন্দরকে বাঁচাতে লাভজিৎ এন সিবির গাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাতজন এনসিবি আধিকারিকদের মধ্যে একজন মহিলা সাব-

ইন্সপেক্টর ছিল। সবাই মিলে লাভজিৎকে এক দফা পেটায়। মাটি থেকে টেনে তুলে গাড়ির সামনে দাঁড় করায়। তারপর বীর বিক্রমে লাভজিৎয়ের মুখে ঘুসি মারে। লাভজিতের একটি দাঁত উৎপাঠিত করে। জসিন্দরকে নিয়ে চলে যায় এন সিবির আধিকারিকরা। লাভজিৎ ও জসিন্দরের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শুরু হয় দরজায় দরজায় কড়া নাড়া জসিন্দরের খবর জানতে। ৪ ঠা মার্চ ছিল হোলি । জসিন্দরের স্ত্রী, দুই বোন ও নাবালক ছেলে হাজির হয় জম্মুতে অবস্থিত এনসিবির অফিসে জসিন্দরের খোঁজ নিতে। এনসিবির আধিকারিকরা তাদেরকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাদের বলা হয় পরের দিন আসতে। পরের দিন সকালে লাভজিৎ, জসিন্দরের দুই বোন ও নাবালক সন্তান চলে যায় এনসিবি অফিসে । সকালবেলা সারাদিন তারা ঠাঁই মেরে বসে থাকে জসিন্দরকে এক পলক দেখার জন্য। তার অবস্থা জানার জন্য। চারটার সময় স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানকে জসিন্দরের সাথে দেখা করার নাম করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদের বলা হয় বাইরে অপেক্ষা করতে। জসিন্দরের সাথে দেখা হওয়ার আশায় লাভজিৎ ছেলেকে নিয়ে অফিসের ভেতরে। জসিন্দরের বদলে দেখা হয় এনসিপির এক আইনজীবীর সঙ্গে। এনসিপির আইনজীবী কুপ্রস্তাব দেয় লাভজিৎকে। লাভজিৎ রাজি হয়নি। জসিন্দরকে আটক করে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো এবং তাকে হাজতে রেখে দিনের পর দিন অকথ্য শারীরিক অত্যাচার করা হয় জসিন্দরের উপর। জসিন্দরের তথাকথিত অপরাধ তার ভাই কুপিন্দরের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের দুটো মামলা ছিল। নারকটিক ড্রাগ অ্যান্ড সাইকট্রফিক সাবস্টেন্স আক্ট এ মামলা। দুটো মামলাতে কুপিন্দরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ধোপে টেকেনি। তাই প্রতিশোধ স্পৃহায় এনসিপির আধিকারিকরা কুপিন্দরের ভাই জসিন্দরকে পাকড়াও করে হাজত হিংসার মাধ্যমে তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ পিপাসা মেটায়। এক নিষ্ঠুর পৈশাচিকী প্রবৃত্তি। আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থার আধিকারিকরা নির্দ্বিধায় ও বিনা বাধায় আইন হাতে তুলে নিয়ে বিএসএফের একজন জওয়ানকে

দিনের পর দিন হাজতে রেখে নৃশংস অত্যাচার করে হত্যা করেছে। জসিন্দরের ১৭ দিনের হাজত ছিল "আইনি পদ্ধতি" অনুযায়ী। আইনি পদ্ধতির অনুষ্ঠান ছিল। ৪ঠা মার্চ জসিন্দরকে আদালতে তোলা হয়। তারপর প্রথমাফিক বিভিন্ন দিনে জসিন্দরকে আদালতে হাজির করা হয়। প্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল ভারতে এখন আসামিকে সশরীরে আদালতে তোলার বাধ্যবাধকতা নেই। ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি আসামিকে সামনে হাজির করানো যায় । আসামি পুলিশ হাজতে অথবা জেল হাজতে। বিচারক আদালত কক্ষে। ভার্চুয়ালি একে অপরের সামনে। অনেক সময় বিচারক চোখ তুলেও দেখেনা আসামীর দিকে। সরকারি আইনজীবীর বয়ান মোতাবেক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোখ বুজে হাজত মঞ্জুর করা হয়। ৪ঠা মার্চ জসিন্দরকে প্রথম আদালতের সামনে হাজির করানো হয়েছিল এবং জসিন্দরের পাঁচ দিনের পুলিশ হাজত চায় এন সিবি। জম্মুর জেলা বিচারক এনসিবির আবেদন মঞ্জুর করে কেন না "Perusal of CD file reveals that investigation in this case in its initial stage and the offences are heinous and non-bailable."

আসামিকে গ্রেফতারের পর ডাক্তারি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তারি পরীক্ষা শুধু নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। পরীক্ষা না করেই রিপোর্ট দেওয়া। জসিন্দরকে যেদিন আটক করা হয়েছিল সেদিন স্ত্রীর সামনেই এক ঘন্টা ধরে জসিন্দরকে বেধড়ক মারধর করে এনসিপির আধিকারিকরা। অথচ ৪ তারিখ ১:৪৫ মিনিটে নাকি সরকারি হাসপাতালে জসিন্দরের ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছিল এবং পরীক্ষার পর রিপোর্টে বলা হয়, আসামি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ। দুদিন পর একই সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার বাবু মেডিকেল রিপোর্টে বলেন, জসিন্দরের শরীরে বাহ্যিক কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। এবং বর্তমানে আসামি শারীরিকভাবে সুস্থ। ৮, ৯ ও ১১ ই মার্চের মেডিকেল রিপোর্টেও একই বয়ান, জসিন্দর শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ। অথচ ওই দিনগুলোতে জসিন্দরের উপর চলছিল প্রচন্ড হাজত হিংসা। ৮ ই

মার্চ জসিন্দরকে আবারো অতিরিক্ত জেলা বিচারকের আদালতে তোলা হয়। ঐদিন আদালত এনসিবির আবেদন অনুযায়ী, পুলিশ হাজতের মেয়াদ আরো ৫ দিন বাড়িয়ে দেন। চার দিন আগের আদেশের বয়ানের পুনরাবৃত্তি ৮ই মার্চের আদেশে । ৯ই মার্চ সামবার মুখ্য জেলা বিচারক মাদক পাচারের একটি মামলায় জসিন্দরের ভাই কুপিন্দর সহ অন্য দুজনকে অব্যাহতি দেন। কেননা মামলায় তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছুই পাওয়া যায়নি। তিনদিন পর জসিন্দরকে আরেকটি মামলা জড়ানো হয় কেননা ইতিমধ্যে প্রথম মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেছে কুপিন্দরের ও দুই আসামির অব্যাহতি পাওয়ায়। এবার জসিন্দরের বিরুদ্ধে নতুন মামলায় হাজত আটকের আর্জি জানানো হয় সামবার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারকের আদালতে। অভিযোগ, জসিন্দর নাকি পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরের সক্রিয় আন্তর্জাতিক মাদক প্রচারের সাথে যুক্ত। এবং যেহেতু সে বিএসএফে চাকরি করছে তাই তার সাথে পাকিস্তানি মাদক পাচার চক্রের যুক্ত থাকার বিলক্ষণ সম্ভবনা আছে। অতিরিক্ত জেলা বিচারক হাত তুলে এন সিবির গল্পে সায় দিয়ে জসিন্দরের হাজত হিংসায় মৃত্যুর ফরমান জারি করেন। অবশেষে জসিন্দর ২০ মার্চ অপরাহ্নে মুক্তি পায় অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে । মৃত্যু মুক্তি এনে দেয় জসিন্দরকে। জসিন্দরের স্ত্রী, পুত্র ও মা নির্বাক। জসিন্দরের চার বছরের ছেলে অপেক্ষা করছে কবে বাবা ফিরে আসবে পুতুল ও হেলিকপ্টার নিয়ে। জসিন্দর তার স্ত্রীও সন্তানকে ত্রিপুরায় নিয়ে যেতে চায়নি কারণ সেখানে থাকার অসুবিধা হবে। জসিন্দর আশা করছিল খুব শীঘ্রই বাড়ির কাছাকাছি বদলী হয়ে আসবে। ছেলেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবে। ৩ তারিখের পর মাত্র একবার ৪ মিনিটের জন্য জসিন্দরের সাথে লাভজিৎ এর কথা হয়েছিল। আটকের ১০ দিনের মাথায় জসিন্দর জম্মুর এনসিবির অফিস থেকে লাভজিতকে ফোন করে জানিয়েছিল এনসিবির আধিকারিকরা তার উপর অসহ্য অত্যাচার করছে। জসিন্দরের স্ত্রীর ভয় ছিল বাড়ি থেকে বহু দূরে ত্রিপুরার সীমান্তে জসিন্দরের কোন বিপদ নিয়ে। সীমান্তে জসিন্দরের মৃত্যুর আশঙ্কা

লাভজিৎকে তাড়া করত। লাভজিৎ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, বাড়িতে ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে জসিন্দরকে জোর করে, রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এনসিবির হাজতে হত্যা করা হবে।

জসিন্দরের অন্ত্যেষ্টি সামরিক মর্যাদায় ২২শে মার্চ সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় পতাকায় তার দেহ মুড়ে বিএসএফ জওয়ানরা তাকে গান স্যালুট দিয়েছে। জম্মুতে বিএসএফ আধিকারিক ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে অন্তিম সৎকার হয়েছে জসিন্দরের।

জসিন্দর হত্যা কি শুধুমাত্র নিছক একটি হাজত হত্যা?

এই হত্যার জন্য কি শুধুমাত্র এনসিবির আধিকারিকরাই দায়ী?

এনসিবির আধিকারিকরা এতটা বেপরোয়া ও দুঃসাহসিক কি করে হয়?

আইনের কোন ভয়ডর তাদের কেন নেই?

কি করে আদালত দিনের পর দিন পুলিশ হাজতের মেয়াদ বাড়ায়, পুলিশ হাজতের অর্ডার দেয়?

মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে কি করে নারকোটিক কন্ট্রোল বোর্ড আইনের উর্ধ্বে উঠে?

কি করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাজতীর শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ঠুটো জগন্নাথ পরিণত হয়ে যায়?

কি করে ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিছক কলাপাতায় পরিণত হয়? কাগজে-কলমে নির্দেশ মানা হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্দেশকে প্রতি পদে পদে লঙঘন করা হচ্ছে।

কি করে অভিযোগ করা মাত্রই ধরে নেওয়া হয় অভিযোগ সত্য?

বিচার বিভাগের নজরদারির দুর্বলতা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলে পর এধরনের হাজত হত্যা ও হাজত হিংসা ঘটতে পারে।

আসামিদের ভার্চুয়ালি উপস্থিত করার পদ্ধতি কি হাজত হিংসাকে আরো নিশ্চিত করছে না?

আসামিকে স্ব-শরীরে উপস্থিত করলে অন্তত আসামি আদালতের সামনে কয়েকটি কথা বলার সাহস করতে পারে। শারীরিক অত্যাচার সম্পর্কে জানাতে পারে। আর ভার্চুয়াল কনফারেন্স তো নিছক লোক দেখানো অনুষ্ঠান হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। আসামি তো একজন নাগরিক। বিচার প্রক্রিয়ায় অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া অব্দি নির্দোষ। নাগরিকদের অধিকারের প্রতি দায়িত্ববান ও সংবেদনশীল থাকা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার গুরুদায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য শুধুমাত্র বিচারকের চেয়ারে বসলে হয় না। নাগরিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সংবেদনশীলতা ও দায়বদ্ধতা জরুরি। পুলিশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এজেন্সিগুলোর কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা উচিত। না থাকা গুরুতর অপরাধ। হাজতে কি হয়, জিজ্ঞাসাবাদের নামে ও তদন্তে সহযোগিতার নামে কিভাবে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করা হয় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা না থাকা অপরাধ। তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের সাথে কিভাবে পুলিশ ও অন্যান্য অপরাধ দমন বাহিনী ব্যবহার করে সেই সম্পর্কে ধারণা না থাকা বিচারক পদের দায়িত্ব পালনের মারাত্মক অযোগ্যতা।

সিসিটিভি ক্যামেরা পুলিশ হাজতে ২৪ ঘন্টা থাকার নির্দেশ কেন পালিত হয় না? এই নিয়ে বিচার বিভাগের সক্রিয়তার অভাব কেন এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

জসিন্দর এক অর্থে রেকর্ড করলো। কারণ হাজত হত্যায় নিহতের অন্ত্যেষ্টি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হয়েছে, গান স্যালুটে বিদায় জানানোর হয়েছে এমন নজির খুজে পাওয়া ইদানিংকালে দুর্লভ।

লাভজিৎ আর ছেলের জন্য জসিন্দর আর কোনদিন ফিরে আসবে না। জসিন্দরের মার চোখে মুখে এখনো আতঙ্ক। ৩৪ টি আঘাতে জর্জরিত ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ছেলেকে শেষ দেখার স্মৃতি জসিন্দরের মাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়াবে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে রিট মামলা হয়েছে সুবিচারের

দাবিতে, হাজার হত্যায় অভিযুক্ত এনসিবির আধিকারিকদের শাস্তির দাবিতে। শুধুমাত্র এনসিবির আধিকারিকদের শাস্তিতেই কি সব শেষ হয়ে যাবে?
যারা জসিন্দরের সতেরো দিনের হাজত বাসকে নিশ্চিত করল একের পর এক আদেশ দিয়ে, যারা একের পর এক মেডিকেল রিপোর্ট দিয়ে বলল সবকিছু ঠিক আছে, জসিন্দরের মৃত্যুর জন্য তারা কি দায়ী নয়?

হাজত হিংসায় জসিন্দরের মৃত্যু ব্যাতিক্রমী ঘটনা নয়। ২০২৬ এর মার্চ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে লোকসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ২০২৫ এর ১লা এপ্রিল থেকে ১৫ ই মার্চ ২০২৬ অব্দি ভারতে পুলিশ হেফাজতে ১৭০ জন মারা গেছেন । জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিয়মিত সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই এই পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে । অর্থাৎ প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় এদেশে পুলিশ হেফাজতে একটি মৃত্যু এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এই মৃত্যুগুলো কোনটাই স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সবগুলোই হাজত হিংসায় হত্যা। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, বিগত পাঁচ বছরে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্যে মাত্র একটি ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে নামমাত্র পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। এই বলে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর বিষয় নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছেন।

বিচার বহির্ভূত হত্যা ও বিচার বহির্ভূত শাস্তি এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা দেশের ক্ষেত্রে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আইন সম্মতভাবে ন্যায় বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে প্রমাণ করার কোন দায় নেই। অভিযোগ ওঠা মাত্রই অভিযুক্তের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সরাসরি এনকাউন্টারের পক্ষে সওয়াল করছেন। মুখ্যমন্ত্রীরা প্রকাশ্যে বলছেন অপরাধীদের এন কাউন্টার করে দেওয়া হবে। এনকাউন্টার অর্থ ঠান্ডা মাথায় অভিযুক্তকে খুন করা। যেকোনো সভ্য দেশে আইনের শাসনের অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, যতক্ষণ অব্দি

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আইনসম্মতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি অভিযুক্ত নির্দোষ। এই ভিত্তিকে এখন উল্টে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে মধ্যযুগীয় কায়দায় কোমরে দড়ি বেঁধে স্বল্প পোশাকে শহরে ঘোরানো হচ্ছে। সবটাই মানবাধিকার বিরোধী। সবচাইতে বিপজ্জনক বিষয় হলো সর্বোচ্চ আদালতের চোখের সামনে, উচ্চ আদালতের নজরের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলো ঘটছে। তারপরও উচ্চ আদালত স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে হস্তক্ষেপ করছে না। উত্তরপ্রদেশে এনকাউন্টার হত্যা এখন জলভাত। প্রত্যেকটি এনকাউন্টার এর ক্ষেত্রে একই গল্প। গোপন খবরের ভিডিওতে অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়, অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে। তখন প্রতিরোধে ও আত্মরক্ষায় আরক্ষা বাহিনী গুলি ছোড়ে ও অভিযুক্ত মারা যায় অথবা গুরুতর আহত হয়। সর্বত্র একই চিত্রনাট্য। দ্রুত বিচার, বুলডোজার বিচার এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরপ্রদেশে এক ভয়ানক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁড়া করে দাও। অপারেশন ল্যাংড়া বা হাফ- এনকাউন্টার। ২০১৭ থেকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এক্ষেত্রে অভিযুক্তকে প্রাণে না মেরে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। ২০১৭ থেকে ২০২৫ অব্দি উত্তরপ্রদেশের পুলিশের হিসাব অনুযায়ী ১৬ হাজার হাফ-এনকাউন্টার হয়েছে। ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্তের পায়ে গুলি বিদ্ধ করে ল্যাংড়া করে দেওয়া হয়েছে। এটাই নাকি উত্তর প্রদেশ পুলিশের জিরো টলারেন্স পলিসি। ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে সংঘটিত ১০০ টি এনকাউন্টার নিয়ে সমীক্ষা করে দেখেছে, প্রত্যেকটি এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে একই ঘটনাপঞ্জি :

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটকানোর চেষ্টা, অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে বা গুলি ছোড়ে। আত্মরক্ষায় পুলিশ গুলি চালায়। গুলি অভিযুক্তের পায়ে লাগে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময়

অভিযুক্তের কাছ থেকে দেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। প্রত্যেকটি এডকাউন্টার এর ক্ষেত্রে একই ঘটনাক্রম। অর্থাৎ প্রত্যেকটি এনকাউন্টার সাজানো এনকাউন্টার। ঠান্ডা মাথায় অভিযুক্তের পায়ে গুলি করে তাকে খোঁড়া করে দেওয়া। উত্তর প্রদেশ পুলিশের লাইন অফ অ্যাকশন এটাই। এটা হাফ-এনকাউন্টার। পুরো এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে একদম শেষ করে দেওয়া হয়। তথাকথিত এনকাউন্টার ডেথ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৪ সনে পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিবার্টিজ বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মান্য করা হচ্ছে প্রতিপালন না করে। অথবা নাম কে ওয়াস্তে তথাকথিত প্রতিপালনের মাধ্যমে। জানুয়ারি ২০২৬-এ এলাবাদ হাইকোর্ট বলেছে, হাফ - এনকাউন্টারের পেছনে কাজ করে সরকারি পুরস্কার ও প্রমোশন পাওয়ার তাগাদা। এলাহাবাদ হাইকোর্ট আরো বলেছে এনকাউন্টারের পেছনেও প্রমোশন ও নগদ প্রাপ্তির প্রেরণা কাজ করে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে অপরাধ প্রমাণ করার বাধ্যবাধকতা এখন নেই। তদন্ত করে চার্জশিট দেওয়া, আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এগুলোর প্রয়োজন নেই। অভিযুক্তের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। অভিযুক্তের আইনি ও সাংবিধানিক অধিকার পুলিশের বুটের নিচে পিষ্ট হচ্ছে। একবার পুলিশের খাতায় অপরাধী হিসেবে নাম উঠলেই হল। তারপর এনকাউন্টার অথবা হাফ - এনকাউন্টার। এক হলে প্রগার পার না হলে খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকা। এটা নিউ নরমাল বা নব্য স্বাভাবিকতা। সংবিধান, আইন, অধিকার, ব্যক্তির মর্যাদা এগুলো সবই থাকবে কেতাবে। বাস্তবের মাটিতে এনকাউন্টার ও হাফ-এনকাউন্টারের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটবে। বলা হবে অপরাধ কমছে। ইনস্ট্যান্ট কফির মত ইনস্ট্যান্ট জাস্টিস বা তাৎক্ষণিক বিচার। এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে দেশ।

জসিন্দররা একা নন। কিছুদিন পূর্বে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে নিহত হয়েছে ৩২ বছর বয়সী দিনমজুর সুশান্ত

শাহু। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, আদালতে পেশ না করেই তাকে একাধিক দিন পুলিশ হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন স্থল কবি সূর্যনগর থানা। হাজত হিংসায় গুরুতর আহত সুশান্ত সাহুকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রথমে তাকে আস্কা মহকুমা হাসপাতালে ও পরে ব্রহ্মপুরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৩১শে মে সুশান্ত সাহু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হাজত হিংসায় হত্যার ঘটনাটি বর্তমানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তদন্তাধীন। ইতিমধ্যে তিনজন পুলিশ আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের ২১ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের অধিকার রয়েছে। বাঁচার অধিকার। জসিন্দর ও সুশান্ত সাহুর বাঁচার অধিকার কারা লঙঘন করলো। আইনের রক্ষকরাই আইনের ভক্ষক। জসিন্দর একজন বি এস এফ জওয়ান। ছদ্ম দেশপ্রেমিকরা এখন কোথায়। তাদের মুখে কোন রা নেই। রাষ্ট্র ক্রমশ হিংস্র চেহারা নিচ্ছে। আদিম হিংস্রতাকে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে নিয়ে আসার ফ্যাসিবাদী প্রকল্প জারি সারাদেশে। মুখে আইন ও সংবিধানের নামের শপথ, কার্যত প্রতিদিন আইন ও সংবিধানকে বাতিল করা হচ্ছে। এ বাতিল প্রক্রিয়ার সর্বশেষ শিকার জসিন্দর ও সুশান্ত সাহুরা। মধ্য দিনে ঘন অন্ধকার। এর বিরুদ্ধে জরুরী নাগরিক প্রতিরোধ। না হলে জসিন্দর ও সুশান্ত সাহুর মত পরিণতি আমাদের যে কারো হতে পারে।

(তথ্যসূত্র দ্যা ক্যারাভান, দ্যা প্রিন্ট, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইত্যাদি।)

একটি জরুরী স্বীকৃতি

- অলকানন্দা চৌধুরী

অবশেষে নারীর গৃহশ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে। ঘোষণা করা হয়েছে প্রতিটি পরিবারে একজন গৃহিণী সার্বিক শ্রমদানের বিষয়টি অর্থমূল্য দ্বারা নির্দিষ্ট করা জরুরী। আর সেই জন্যই ভারতীয় জনগনরা একটি সম্পূর্ণ অবহেলিত বা স্বল্প আলোচিত বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে। বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি এন কে সিনহা একটি ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলায় রায় দিয়েছেন , গৃহ অভ্যন্তরে নারীর সেবা কার্যের ন্যূনতম অর্থ মূল্য হবে প্রতি মাসে তিরিশ (৩০) হাজার টাকা।

ভারতীয় সমাজ জীবনে পরিবারে নারীর অবদানকে হয়তো স্বীকার করা হয় কিন্তু তার আর্থিক মূল্য আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ এক কথায় অভূতপূর্ব। গৃহিনীদের শ্রমের মূল্য দেওয়া হোক এই বিষয়ে কিছুটা ক্ষীণ আওয়াজ উঠেছিল । যার প্রতিবাদে এমন মন্তব্য ও শোনা গেছে তখন সোনার সংসার আর সোনাগাছিতে (পতিতালয়ে) তফাৎ থাকবেনা। তার মানে নারীকে তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যায় কিন্তু তার সেই অবদানের অর্থ মূল্য চাওয়া বা দেওয়া গর্হিত আচরণ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই চিরাচরিত ভ্রান্ত মানসিকতার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ বিষয়ে এতটা নেতিবাচক মনোভাব আজও ক্রিয়াশীল। সুখের কথা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই জরুরী বিষয়টিকে আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করেই গৃহিণীদের সংগত অবদানের অর্থ মূল্য নির্ধারণ করেছেন সঠিকভাবে।

সাধারণত মোটর ভেহিকেলস আইন অনুসারে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম আছে। সেখানে বলা হয়েছে কোন উপার্জনশীল ব্যক্তির দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির বাকি কর্মজীবনে সম্ভাব্য আয় কে ভিত্তি করে

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ যাবত নির্দেশ অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকার অংক নির্ধারিত হয়। পরিবারের কোনো গৃহিণী হয়তো তিনি কোন উপার্জন করেন না অর্থাৎ পরিবারে তার রোজগার থেকে কোন অর্থ আসে না তবু তার মৃত্যু হলে গৃহস্থালির ক্ষেত্রে তার অবদান বন্ধ হয়ে যায়। সেই ক্ষতির পরিমাণ প্রতিমাসের ন্যূনতম ত্রিশ হাজার টাকা ধরেই ক্ষতিপূরণ জনিত টাকার পরিমান নির্ধারিত হবে । তিনি যদি উপার্জন শীল হন তবুও গৃহস্থালী পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ তার প্রাপ্য। এই রায়দানের নেপথ্যে রয়েছে ২০০১ সালের একটি ঘটনা। পাঞ্জাব রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক গৃহিণী পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের অংক নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। সে মামলায় রায়দানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা সর্বোচ্চ আদালত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করেছেন। সেই দিক গুলি হল একটি পরিবারে গার্হস্থ কার্যপ্রণালী সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য গৃহিণীর অবদান , সন্তান লালন পালনে মা হিসেবে অবদান এবং স্বামীসহ তার পরিবারের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে তার সার্বিক সহায়তা। এই প্রতিটি কারণে একটি নারীর অনুপস্থিতির জন্য যে ক্ষতি হয় তারই উপর ভিত্তি করে ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ন্যূনতম অংক ধার্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তিন বছর অন্তর এই টাকার পরিমান ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে।

সর্বোচ্চ আদালতের সময়োপযোগী ও জরুরী পদক্ষেপ ভারতীয় গৃহিণীদের জন্য যথাযোগ্য সম্মান বলেই ধরে নেওয়া যায়। যতই তাদের হোমমেকার বলে গাল ভরা নাম দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হোক সমাজ কিন্তু এখনো তাদের বিনামাইনের ঝি বলে ভাবতে অভ্যস্ত। অথচ বিভিন্ন সমীক্ষা বলে তাদের বেতনহীন পরিচর্যা ভারতবর্ষের মোট জিডিপির প্রায় ১৫ থেকে ২৭ শতাংশের সমতুল্য কিন্তু তার আর্থিক মূল্য নির্দিষ্ট নয় বলে সেটা কখনোই স্বীকৃতি পায়না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মাত্র ২৩.৫% মেয়ে কাজ

করে। অথচ বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি মেয়েরা পরিবারে গৃহ পরিসরে কাজ করে। কিন্তু গৃহশ্রম বলে এর কোন মূল্যায়ন হয় না। সেইসব নীরব কর্মীরা পরিসংখ্যানের বাইরে অদৃশ্য হয়েই থেকে যান। ঠিক তেমনি মানুষের জীবন যাত্রার মসৃণ গতির ক্ষেত্রেও মেয়েদের অবদান বিষয়ে সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন। পরিবেশের চরম পরিবর্তনের অভিঘাতেও নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয় নানাভাবে। পানীয় জলের অভাব , জলস্তর নেমে যাওয়া ইত্যাদির কারণে জল সংগ্রহ করে পারিবারিক জীবনযাত্রা সচল রাখার দায়িত্ব তো মেয়েদের ঘাড়ে পড়ে। অরণ্য সংরক্ষণ আইনের কড়াকড়িতে আদিবাসী নারীদের বহুদূর হেঁটে জ্বালানির জন্য শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করতে হয়। গ্রামের পুরুষেরা রোজগারের আশায় অন্যত্র চলে গেলে পরিবার প্রতিপালনের কঠিন দায়িত্ব মেয়েরা পালন করে। লেখিকা অনিতা অগ্নিহোত্রী মন্তব্য করেছেন ---- "বিশ্বায়ন এলো , ঘনিয়ে উঠলো তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব , দরিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা কমলো , অথচ মেয়েদের শ্রম তো কমলো না, না হলো তার যথার্থ মূল্যায়ন না পেলো তারা পুরুষের সমান মজুরি। ওই মেয়েরা আমাকে বলেছিল আমকাটাই এর কাজে বলদের দাম মেয়ে মানুষের চেয়ে বেশি। বলদ মরলে তার বীমার টাকা পায় তার পুরুষ মালিক, কিন্তু বউ মরলে" ?

ওইসব শ্রমজীবী এবং গার্হস্থ্য জীবনে খেটে মরা মেয়েরা হয়তো এবার এই আক্ষেপ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু একই সাথে মনে কিছু আশঙ্কা ও জাগে। ভবিষ্যতে আবার দুর্ঘটনায় মৃত গৃহিণী সংখ্যা বেড়ে যাবে না তো? কারণ ৩০ হাজার টাকার লোভনীয় হাতছানি উপেক্ষা করার সাধ্য তো সবার নেই।

তবুও আমরা আশা করব সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায় শুধু একটি আইনি ঘোষণা হয়েই থাকবে না। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে , ----- নারীর গৃহশ্রম মূল্যহীন নয়।

ত্রিপুরার ৩৬ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীর অন্ধকারময় জীবন অবসানের দাবী জয়ী হবেই

- রতন দেবনাথ

ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম চালিকাশক্তি হলেন হাজার হাজার অনিয়মিত কর্মচারী। বছরের পর বছর তারা নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের সঙ্গে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অথচ তাদের জীবন আজও অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা ও অবহেলার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

বামফ্রন্ট সরকারের সময় অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের একটি সুস্পষ্ট স্কিম চালু ছিল। সেই স্কিমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় চাকরি সম্পন্ন করার পর কর্মচারীরা নিয়মিত হওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৮ সালের ৩১ জুলাই সেই স্কিম বাতিল করে দেয়। ফলে হাজার হাজার অনিয়মিত কর্মচারী দীর্ঘ ১০ বছর বা তারও বেশি সময় চাকরি করেও নিয়মিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হলো, শাসক দল ২০১৮ নির্বাচনের আগে তাদের ভিশন ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যে ক্ষমতায় এলে ছয় মাসের মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান করে নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি।

এর ফলে অসংখ্য কর্মচারী জীবনের সেরা সময় সরকারকে সেবা দেওয়ার পর অবসরে চলে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ খালি হাতে। নেই কোনো পেনশন, নেই অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা, নেই ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছেন।

ভারতের অধিকাংশ রাজ্য সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতকরণ, আর্থিক অনুদান অথবা সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু ত্রিপুরায় সেই ধরনের কার্যকর কোনো উদ্যোগ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করে অনিয়মিত কর্মচারীরা নিয়মিতকরণ কিংবা সমকাজে সমবেতনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ রায় লাভ করলেও যারা মামলা করেছেন তারা বাদে অন্যাদের ক্ষেত্রে বাস্তবে সেই অধিকার আজও অধরাই রয়ে গেছে।

প্রশ্ন উঠছে—এই অসহায় কর্মচারীরা কোথায় যাবেন? তাদের অধিকাংশের পক্ষেই লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই আজ তাদের জীবন যেন অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ গত দুই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন, গণসংযোগ এবং আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনটি অনিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমর্থন অর্জন করেছে। এই সংগ্রামে বিশিষ্ট আইনজীবী

পুরুষোত্তম রায় বর্মনসহ বহু বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা ও সমর্থন জানিয়েছেন।

ইতিহাস সাক্ষী, ন্যায়ের দাবিকে দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা যায় না। যে দাবি ন্যায্য, যে সংগ্রাম মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সেই সংগ্রাম একদিন না একদিন সফল হবেই। সরকার যতই উদাসীন বা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করুক না কেন, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত আন্দোলনের শক্তিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

ত্রিপুরার প্রায় ৩৬ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীর এই দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবি। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের স্বার্থে সরকারের উচিত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কারণ, যারা বছরের পর বছর রাষ্ট্রের সেবা করেছেন, তারা অবহেলা নয়—সম্মান, নিরাপত্তা এবং ন্যায্য অধিকার পাওয়ার যোগ্য।

টি এইচ আর ওর তৃতীয় খোয়াই জেলা সম্মেলন

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অরগানাইজেশনের (টি এইচ আর ও) তৃতীয় খোয়াই জেলা সম্মেলন ২৬শে জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। খোয়াই প্রেসক্লাবে আয়োজিত সম্মেলনে মানবাধিকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সামন্তা সাহার পরিবেশিত উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। বিদায়ী সম্পাদক আশীষ মুখার্জী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। খোয়াই জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি, টি এইচ আর ওর সাংগঠনিক তৎপরতা, কোভিড কালে টি এইচ আর ওর উদ্যোগে ত্রাণ প্রদান, প্রান্তিক অংশের মানুষের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি বিষয় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে সরকারি বিদ্যালয় সমূহের দুরবস্থা, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষার অধিকারের ব্যাপক উলঙঘন ইত্যাদি। মানবাধিকার পরিস্থিতির সামগ্রিক বিপন্নতা নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন।

জেলা সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন টি এইচ আর ওর অন্যতম সহ-সভাপতি মৃন্ময় চক্রবর্তী। টি এইচ আর ও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে। তিনি খোয়াই জেলায় টি এইচ আর ও সদস্যদের অভিনন্দন জানান তাদের দৃঢ় ভূমিকার জন্য। আগরতলায় অনুষ্ঠিত টি এইচ আর ওর বিভিন্ন কর্মসূচিতে খোয়াই জেলার সদস্যদের নিয়মিত অংশগ্রহণের সপ্রশংস উল্লেখ করেন তিনি। ফ্যাসিবাদী শাসনে গনতন্ত্র, আইনের শাসন, সংবিধান চূড়ান্তভাবে বিপন্ন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে মানবাধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী নাগরিক প্রতিরোধে রুপান্তরিত করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে ২৬ জনের খোয়াই জেলা কমিটি

নির্বাচিত হয়েছে। আশীষ মুখার্জি সম্পাদক, বিনোদ শুক্ল বৈদ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ নীরোদ দাস। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিত সাহা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার : প্রতিবাদে ও উদযাপনে টি এইচ আর ও

- মনিময় রায়

আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন টি এইচ আর ও

দুষ্কৃতীদের হাতে পুলিশের সামনেই মার খেয়ে হাসপাতালে প্রাক্তন সেনা কর্মী

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী বর্তমানে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কর্মী অনুপ ঘোষ। তাঁর অপরাধ তিনি দশরথ দেব স্টেডিয়ামের মূল ফটকের ঠিক উল্টো দিকে তাঁর অসুস্থ দিদিকে দেখতে গিয়েছিলেন।অনুপ ঘোষ অভিযোগ করেন , তিনি গত ১৯ জুন রাতে দিদির অসুস্থতার একটি ফোন পেয়ে দিদির বাড়িতে যান। সেখানে পৌঁছে বাড়িতে ঢোকার মুখে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রান্ত হয়ে যান এবং সেটা পুলিশের সামনে।অনুপবাবু বলেন "আমি রাতে খেতে বসেছি এমন সময় আমার ভাইপোর ফোনে দিদির বাড়িতে অতিসত্বর যাওয়ার জন্য দিদির বাড়ির ভাড়াটিয়া বলেন"। দিদির শারিরীক অবস্থা খারাপ হয়েছে এই মনে করে তিনি গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে যান।তারা কেন এসেছিল সেটা বোঝার সুযোগ ছিল না।মারমুখী দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি দিদির বাড়ির ছাদে উঠে গাছ বেয়ে নেমে পালাতে চেয়েছিলেন । কিন্তু দুষ্কৃতীরা ধরে ফেলে। তিনি বলেন , তাঁকে টেন হিঁচড়ে নিয়ে এসে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়, তাঁর স্কুটি ড্রেনে ফেলে দেয়া হয়। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে করে তারা মার থামায়। অনুপ বাবু বলেন "আমি বাড়িতে যখন প্রথম পৌঁছাই তখন থেকেই একজন মহিলা পুলিশ অফিসারকে দেখি , তিনি নিজেকে আমতলী থানার বলে

পরিচয় দিয়েছিলেন।"পরে অনুপ বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেও তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয় পুলিশের সামনে। ইতিমধ্যে অনুপ বাবুর দাদা হাসপাতালে পৌঁছে ভাই অনুপকে সুচিকিৎসার জন্য আই এল এসে নিয়ে যেতে নিরাপত্তা দাবি করেন। তখন তাঁরা জানতে পারেন যে অনুপ বাবুর আক্রান্ত হবার জায়গাটি অরুন্ধুতি নগর থানার এলাকায়। তাহলে আমতলী থানার মহিলা অফিসার নিজের এলাকার বাইরে (দশরথ দেব স্টেডিয়ামের কাছে)দুষ্কৃতীদের সাথে কেন ছিলেন? অনুপ বাবু সেই প্রশ্ন তুলেছেন। চিকিৎসিত হয়ে বাড়ি ফিরে তিনি এফ আই আর করেছেন।কেউ গ্রেফতার হয়নি।

টি এইচ আর ও এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা। নিজ পুলিশ এলাকার বাইরে ঐ পুলিশ অফিসার কেন গিয়েছিলেন এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরক্ষা প্রশাসন ঐ মহিলা পুলিশ অফিসারকে কারন দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন।একে " আই ওয়াস" বলে অভিহিত করে ঐ দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে টি এইচ আর ও ।

"টাকারজলার ঘটনা সভ্যতার কলঙ্কজনক অধ্যায়"

মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন টি এইচ আর ও

দুষ্কৃতীদের আস্ফালন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও পরপর প্রাণঘাতি আক্রমণের ঘটনায় স্তম্ভিত রাজ্যের মানুষ , উদ্বিগ্ন টি এইচ আর ও। একটি বেসরকারি হাসপাতালে সম্প্রতি একজন মহিলা কর্মীর (মনিষা দাস)রহস্য জনক মৃত্যুর পর তা নানাভাবে ও রহস্যজনকভাবে ধামাচাপা দিতে প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। ঘটনা আবিষ্কৃত হবার প্রায়

সঙ্গে সঙ্গে সাব ডিভিশন পুলিশ অফিসার একে (পোস্টমর্টেম হবার আগেই) যেভাবে আত্মহত্যা বলে মন্তব্য করেছেন তাতে ধামাচাপার তত্ত্বকে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছেনা বলে টি এইচ আর ও মনেকরে। যেখানে মৃতার মা -বাবার অভিযোগ রয়েছে ঠিক উল্টো। যদিও ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়েছে । পশ্চিমজেলার জেলা শাসক তদন্ত করছেন। পনেরো দিনের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দেবার কথা।এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ঐ রিপোর্ট জমা পড়েছে বলে শোনা যায়নি। টি এইচ আর ও তদন্ত শুরু হবার আগেই মৃত্যুর কারণ একজন পুলিশ অফিসার বলে দেবার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে। এতে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত চলবে কিনা তাতে সংশয় প্রকাশ করেছে টি এইচ আর ও।

একই এলাকায় (কাঁঠালতলীতে) গত ২২শে জুন রাতে সমীর দাস নামে এক যুবক খুন (পুলিশের দাবি)হন।নিহত সমীর এবং অভিযুক্ত দুজন ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতাবান বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। এলাকায় এই খুনের ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। স্থানীয় মানুষ অভিযুক্তদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে পুলিশের সামনেই। টি এইচ আর ও এই খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সুষ্ঠুভাবে তদন্তের দাবি জানিয়েছে।একই সাথে আইন নিজের হাতে তুলে না নিতে আবেদন জানিয়েছে। সম্প্রতি পরপর কয়েকটি ঘটনা, রাজ্যের চরম আইনশৃঙ্খলার অবনতি বলে চিহ্নিত করে টি এইচ আর ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এরমধ্যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে বিশালগড় মহকুমার টাকারজলা এলাকায়। সেখানে বেআইনিভাবে এক মহিলাকে 'খাপ পঞ্চায়েত' ডেকে এনে বেধড়ক মারধর করা হয়। বিভৎসতা ও সভ্যতার সমস্ত সীমা লঙঘন করে মহিলার ওপরে নারকীয় অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়। পুলিশ প্রশাসন নির্লজ্জ নিরব ভূমিকা পালন করেছে। আক্রান্ত মহিলার জটিল অস্ত্রপোচার হয় জিবি হাসপাতালে। তিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন,আর বিড়বিড় করে অপরাধীদের নাম বলছেন।টি এইচ আর ও এই ঘটনাকে সভ্যতা বর্জিত ঘটনা বলে চিহ্নিত

করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।টি এইচ আর ও ঘটনাটি নিয়ে টাকারজলা থানার নির্লিপ্ত নিরব ভূমিকারও নিন্দা করেছে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে

উদ্বেগ প্রকাশ করার পরই টাকারজলা থানা নড়াচড়া শুরু করে।দুজন মহিলাকে আটক করলেও মূল আসামীকে এখনো এক অজ্ঞাত কারণে ছেড়ে রেখেছে পুলিশ। মহিলাদের প্রতি রাজ্যে আক্রমণের ঘটনা দিনকে দিন বেড়ে চলায় টি এইচ আর ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

টি এইচ আর ওর মহিলা আইনজীবীদের এক প্রতিনিধি দল জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন নির্যাতিতাকে দেখে আসেন, ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবহিত হন। দোষীদের শাস্তি দাবি করেন।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, দুর্গা চৌমুহনী বিপনিবিতান, কর্তৃক থেকে প্রকাশিত

সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মন